আমার দেখা এবং না-দেখা চিন

দিব্যেন্দু পালিত

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দিল্লি থেকে ফোন করলেন সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি গোপীচাঁদ নারাং--- ভারতীয় লেখকদের একটি দলকে চিন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে দেশের রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন। সাহিত্য অকাদেমির দায়িত্ব প্রতিনিধি নির্বাচন এবং তাঁদের সম্পর্কে তথ্য পাঠানো--- আমি সেই দলে যেতে রাজি আছি কিনা। নারাং বললেন দিন পনেরোর ভ্রমণসূচি। সব দায়িত্ব চিন সরকারের। কিঞ্চিত অবাক হলেও সম্মতি জানিয়ে দিলাম।

অবাক হওয়ার কারণ আমার কাছেই একটু অস্পষ্ট। ভারতীয় লেখকদের দলে কে কে নির্বাচিত হবেন এবং আমার ভূমিকা কী হবে। এর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হয়ে গেলেও চিন ভ্রমণের পরিকল্পনা কোনদিনই ছিল না। ভৌগোলিক আয়তনে রাশিয়া ও কানাডার পরে বৃহত্তম দেশ, একশো তিরিশ কোটি জনসংখ্যায় পুষ্ট চিনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার ধারণা নিতান্তই আবছা। পাঠ্যপুস্তক থেকে যা জেনেছি বস্তুত তার বাইরে প্রায় কিছুই জানিনা--- একটা নিষিদ্ধ ফলের মত চিন আমাদের কৌতূহল নিরস্ত করে রাখত। মাও সে তুঙের জীবনী থেকে তাঁর ঐতিহাসিক লং মার্চ - এর বিবরণ, এমনকি তাঁর কবিতা পর্যন্ত পড়া ছিল। পড়েছি লু সুনের বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ গল্প, যেমন পড়েছি চিনের পটভূমিকায় পার্ল এস বাক্ - এর ‘গুড আর্থ্’ তার চলচিত্র রূপও দেখেছি-- এইসব এবং আরও কিছু, চিন বলতে এই। এসব ধারণা আবছা হতে শু করে চিনের তিববত অধিকার, ভারত - চিন যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনায়, তারপর একেবারে কাছাকাছি সময়ে তিয়েতনানমেন্ স্কোয়ারের রত্তাত্ত ঘটনা, নির্মম গণহত্যা।টেলিভিশনে অলিম্পিক গেমসে চিনের অসাধারণ কৃতিত্ব দেশে এশিয়ার অন্তর্ভুত্ত একটি দেশের গৌরবে এশিয়াবাসী হিসেবে পুলকিত বোধ করলেও সেসব অনুভূতি আড়াল করে রেখেছিল বিশেষত তিয়েনানমেন্। ছোটবেলাথেকেই বিশ্বের ৭ম আশ্চর্যের অন্যতম চিনের মহাপ্রাচীর কোনদিনই দেখা হবে না এরকম একটা দুর্ভাবনা কাজ করত মনে। চিনকে চেনানো এই একটি প্রতিভূ সম্পর্কেবাঙালি এতটাই দুর্বল যে, চোখে না দেখলেও মোহনবাগানের দুরন্ত ফুটবলার গোষ্ঠপালকে তাঁর দুর্লঙ্ঘ্যতার জন্য নামকরণ করেছিল ‘চিনের প্রাচীর’।

ইতিহাস বদলায় চিনও বদলেছে, ভ্রমণ। তিয়েনানমেন্ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা হলেও তা স্মৃতিতে থাকুক, চিনের পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - চিন্তা বদলেছে আমূল, যেমন বদলেছে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। বিশ্বায়নের প্রভাব দেশটিকে এক ধাক্কায় পৌঁছে দিয়েছে চূড়ান্ত প্রগতি ও উন্নয়নের পথে। চিন বর্তমানে বিত্ত - সম্পদ - বাণিজ্য ইত্যাদিতে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। চিনে গিয়ে সে দেশে উন্নতির চেহারা দেখে মনে হল সব ঠিকঠাক চললে সামনের ১০-১২ বছরে চিন আমেরিকাকেও টেক্কা দেবে। তা নিয়ে চিনাদের কোন ঢাক - ঢোল পেটানো নেই; তারা শুধুই কাজ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী।

কিন্তু চিন ভ্রমনের সমস্যাও কম নয়। প্রথম সমস্যা, মনে হল, সে-দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের অভাব। আর এ সমস্যা ভাষা। চিনা ভাষা আমি একবর্ণও বুঝি না। চিনে যাঁরা বিশ্বায়ন নিয়ে কাজকর্ম করেন এবং কোন - না কোনভাবে সে দেশের পররাষ্ট্রনীতি রূপায়নের জন্য কাজ করেন, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে যুত্ত, তাঁরা হয় ইংরেজি জানেন, বোঝেন এবং বলেন, আমি ঠিক জানি না। এতদিন দেশে - বিদেশে নানা জায়গায় কম ঘুরিনি এবং তা ঐ ইংরেজির ওপরই ভরসা রেখে। কিন্তু, ভেবেছি, এমন দেশ ও মানুষ আছেন তাহলে যাঁরা ইংরেজি না জেনেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। পরে ভাবলাম অ

াগেও তো অনেকে গেছে চিনে, নিশ্চয় চিনা ভাষা না শিখেও কাজ চালিয়ে ফিরেছেন, --- তাঁরা কিভাবে পারলেন! ভাবল াম দোভাষী নিশ্চয় থাকবেন আমাদের গাইড করার জন্য, আর আমি একাই তো যাচ্ছি না। কোন দলে থাকার সুবিধে এই , সুবিধে হোকবা অসুবিধে, তা ভাগ করে নেওয়া যায়।

এইসব উড়ো চিন্তার মধ্যেই দিল্লি থেকে আমন্ত্রণমূলক পাকা চিঠি এসে গেল। সাহিত্য অকাদেমির সচিব কে, সচিদানন্দন জানিয়েছেন ৯ অক্টোবর চিনের উদ্দেশে রওনা হতে হবে দিল্লি থেকে। সুতরাং ভিসা'র জন্য অবিলম্বে তাঁর কাছে আমার পাসপোর্ট পাঠিয়েদিতে হবে।

বছর ঘুরতে চলল। একবছর আগে চিনে গিয়ে কি কি ঘটেছিল তা ঠিকঠাক মনে নেই। আমার স্মৃতি তেমন প্রখর নয়, ড ায়েরি বা নোটবইও রাখিনি যাতে প্রতিটি ঘটনা টুকে রাখা যায়। তবে কেউ কেউ থাকেন এরকম গোছানো স্বভাবের -- অ ামাদের দলেও ছিলেন তিনচারজন, যাঁরা নোট যত নিয়েছেন, আশ - পাশের তাকিয়ে দেখেননি তত।

দলের এক প্রাবন্ধিক বন্ধু এতই তৎপর হাতে খুঁটিনাটি নোট নিচ্ছিলেন যে বেজিং-এ প্রথম রাতেই হোটেল তিবেত - এ ডিন ারটেবিলে তাঁর নোট বইটা জুত করে ধরতে গিয়ে উল্টে ফেললেন স্যুপের বৌল। নিজের পোষাক তো ভেজালেনই, আম াদের সঙ্গী চিনাগাইডের স্যুটও নোংরা করলেন। ভদ্রলোকের ব্যাজার হাসিমুখ দেখে মনে হল ঘটনাটি তিনি জীবনে ভুলবেন না। জানিনা, আমাদের এই বন্ধু তাঁর ভ্রমণ - বৃত্তান্তে এই ঘটনাটি উল্লেখ করবেন কিনা।

এই জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় আমার বিশ্বাস। একটি অজানা অচেনা দেশে সাত - দশক কি পনের দিন কি একমাস ভ্রমণ করে কতটা চেনা যায় সেই দেশের সমাজ - সংস্কৃতি ও মানুষজনকে? আদৌ কি জানা যায় কিছু? গাইড-পরিবৃত হয়ে পূর্ব - পরিকল্পিত ছকে আমাদের যে ভ্রমণ, তাতে আতিথেয়তা - আপ্যায়নে একটুকু ত্রুটি না থাকলেও, নিজেদের ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা ছিল না। অবশ্য, স্বীকার করতেই হবে, উদ্যোক্তারা আমাদের থাকার জন্য চার - তারা বা পাঁচ - তারা হোটেলের ব্যাবস্থাই শুধু করেননি,আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন চিনের বিখ্যাত ও দর্শনীয় যে - সব জায়গায় এবং যে-নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থাপনায়, তা সহজে কল্পনা করা যায় না। এসব আয়োজনের মধ্য দিয়েই দেখেছি চিনারা কতদূর শৃঙ্খল ায় বিশ্বাস করেন, কতটা সময় - সচেতন ইত্যাদি। শুধু যে তাঁরা নিজেরাই নিয়মনিষ্ঠ তা নয়, যাতে তাঁদের অতিথিরাও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেন, তাঁদের হাবভাব দিয়ে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন বারবার। যে সব কারণে একটি জাতি নিজেকে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে, এবং আর - পাঁচটি জাতিকে ও দেশকে ছাড়িয়ে যায়, চিনাদের সার্বিক আচরণের মধ্যেও তার প্রমাণ পেয়েছি।

৯ তারিখ বিকেলে চিনযাত্রী সাহিত্য আকাদেমির দলটিকে চায়ে ডাকলেন সভাপতি। এই দলে সবচেয়ে প্রবীণ সুখ্যাত তেলেগুভাষাতাত্ত্বিক ড. বি. এইচ. কৃষ্ণমূর্তি, তিনিই দলমুখ্য, অন্যরা হিন্দি - বাংলা - কন্নড় - খাসি- গুজরাতি - পাঞ্জাবি - ওড়িয়া- উর্দু - তামিলভাষায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে ওড়িয়া ও তামিল ভাষার প্রতিনিধি দুজন মহিলা। পরিচয় হল, আলাপ হবে ক্রমশ।

সময় কম, সেই সন্ধ্যাতেই প্রায় দৌড়তে হল পঞ্চশীল মার্গ, চাণক্যপুরী, ঠিকানায় চিন প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসে, সংস্কৃতি - উপদেষ্টা ঈয়াং লিনহাই-এর ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পরিচয়পর্ব সারা হওয়ার পর আমাদের টুকটাক প্রশ্নের জবার দিলেন তিনি ও তাঁর দুই সহকর্মী। তারপর দূতাবাসের প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে গিয়ে দেখালেন চিনবিষয়ক তথ্যচিত্র। আমরা য াবো বেজিং, সিয়ান্, হ্যাংজো এবং সাংহাই; প্রধানত এই শহরগুলিতে এবং প্রাথমিক তথ্যে যা জেনেছি, এদের কেন্দ্র করে আশপাশের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে, যার মধ্যে আছে টেরাকোটা মিউজিয়াম, লু সুনের ভিটে ইত্যাদি। প্রত্যেক শহরেই থ াকছে চাইনিজ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বিভিন্ন মিটিং। অবাক হলাম ঝকঝকে তথ্যচিত্রে সাংহাইকে বিশদ ভ াবে দেখালেও নেই বেজিং। লিনহাইকে করলাম প্রশ্নটা। তিনি শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যপারটা আমরাও লক্ষ করেছি।' আর কোন কথা নয়।

এই ব্যাপারটা পরেও লক্ষ করেছি, চিনারা যেটুকু বলতে চায় তার বেশি শোনাতে চায় না, তার পরেও প্রশ্ন করলে দেখতে হয় শুধুই হাসিমুখ।

সেদিন নৈশাহারেই প্রথম টের পেলাম চিনা খাবার বললে ভারতের সর্বত্র হোটেল - রেস্তোরাঁয় আমরা যা পেতে ও খেতে অভ্যস্ত, তা কিন্তু আসল চিনা খাবার নয়। চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস এখানে নেই, বরং প্রচুর স্যালাড, মাংস-মাছ

ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে। ‘রাইস’ বলতে শেষ পাতের দিকে দলা পাকানো ভাত। অবশ্যই গোড়াতে স্যুপ ছিল। আসলে চাইনিজ খাবার যা ভারতীয় রেসতোরাঁগুলিতে পাওয়া যায় তা ভারতীয়দের নিজস্ব আবিষ্কার। চিনে গিয়ে তা আরও ভাল করলে মালুম হল।

রাত্তির এগারোটা নাগাদ আমরা দুটি গাড়িতে লটবহর সমতে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হলাম। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট নাম্বার ত্তহ৫৬৭ছাড়ার কথা রাত আড়াইটের। কিন্তু এরই মধ্যে লেট ঘোষণা করেছে। সিটিং লাউঞ্জ গিস্‌গিস্‌ করছে মেয়ে - পুষ এমনকি শিশুর ভিড়ে। দের অধিকাংশই ভারতীয়। ভাবলাম, তাহলে এত সংখ্যায় ভারতীয় চিনে যায়!

বেলা ১০টা নাগাদ সাংহাই-এ পৌঁছলাম, দিল্লি থেকে টানা উড়ান। এখানে নামতে হল আমাদের। নতুন করে সিকিউরিটি চেক করিয়ে উঠতে হবে বেজিং -এর ফ্লাইট-এ। মাটিতে পা রেখে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। এত চিন্তাভাবনা সন্দেহের পরে চিনে পৌঁছলাম শেষ পর্যন্ত! জানি না নতুন কোন্‌ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।

চিনের সময় আমদের সময়ের চেয়ে দু’ঘন্টা এগিয়ে, তার অর্থ বারোটা বেজে গেছে। রাতের ফ্লাইটে ঘুম হয়নি ঠিকঠাক, তার জের টানছে শরীর। চারপাশে তাকিয়ে মনে হল আমরা কোনও বৃহতের সান্নিধ্যে এসে পড়েছি। আকাশছোঁয়া কাঠামো চারদিকে, আর থেকে - থেকে প্লেনের ওড়া ও নামার শব্দ আর ঘোষিকার কণ্ঠে চিনা ভাষায় হাবিজাবি ঘোষণা--- সব মিলিয়ে সৃষ্টি করে নতুন আচ্ছন্নতা। ওরই মধ্যে ট্রানজিট প্যাসেনজারদের জন্য নির্দিষ্ট লাউঞ্জ-এ যেতে - যেতে লক্ষ রাখি সহযাত্রীদের ওপর। মাঝে মধ্যেই সিঁড়ি ওঠা এবং নামা, একটা সময়ের পরে ভুলে যেতে হয় কোথায় শু করেছিলাম। এতটা রাস্তা হাঁটা সত্যিই ক্লান্তিকর। সাংহাই যে বিশাল এবং নিজের ধরনে অত্যন্ত আকর্ষক, গতকাল রাত্রে চিনা দূতাবাসে প্রদর্শিত তথ্যচিত্রেই তা টের পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এসে ল্যান্ডিং পয়েন্ট থেকে লাউঞ্জ-এ পৌঁছতেই এত পরিশ্রম করতে হবে কেন!

আমাদের প্রধান কৃষ্ণমূর্তিকে দেখলাম এগোচ্ছেন অল্প খুঁড়িয়ে, বাঁ পায়ে সামান্য টান আছে ভদ্রলোকের, তার ওপর এই পরিশ্রম - সাধ্য হাঁটাহাঁটি, ক্লান্তি লাগতেই পারে। তা ছাড়া কাল রাতে দিল্লি এয়ারপোর্টে ডিউটি ফ্রি শপ্‌ থেকে সাতাশ ডলার দিয়ে চিনে গিয়ে পান করা যাবে মনে করে যে ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কির বোতলটি কিনেছিলেন, শেষ মুহূর্তের চেকিংয়ে সেটি কেড়ে নেয় সিকিউরিটির একজন। অনেক মিনতি করার পরও চিনা সিকিউরিটির অফিসার ‘নো ড্রিঙ্কস্‌ অ্যালাউড’ বলে সেটি সঙ্গে নিতে দেয়নি। এই নিয়ে মস্ত আক্ষেপ কৃষ্ণমূর্তির। সাতাশ ডলার এর শোক তাঁকে দমিয়েও দিয়েছে একটু।

ট্রানজিট লাউঞ্জে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পরে বেজিং ফ্লাইটের ঘোষণা শুনলাম। ইতিমধ্যে একটুকরো কেক ও গরম কফিখেয়ে খানিকটা চাঙ্গা লাগছে। প্লেনে উঠে দেখলাম সেই একই এয়ারক্রাফ্ট্‌, শুধু হোস্টেস বদলেছে। আমাদের মত ট্রানজিট যাত্রী ছাড়াও নতুন যাত্রী এসেছেন কিছু। একটি জিনস ও টি- শার্ট পরা ভারতীয় যুবতীকে দেখলাম, তিন মাসের বাচ্চা কোলে যাচ্ছে বেজিঙে। আসলে দিল্লি থেকেই আসছে সে, রাতে লক্ষ করিনি। নাম সোনু। মারাঠি কিংবা গুজরাতি। ভারতীয় এই যুবতীর স্বামী বেজিঙে ইলেকট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ার -- বাচ্চা হওয়ার জন্যই দেশে গিয়েছিল মা - বাবার কাছে। এখন একাই ফিরছে। পঁচিশ - ছাব্বিশের এই যুবতীর সাহস আছে বলতে হবে। চিন বলতে যত দুর্ভাবনা আমাদেরই! বিশাল বেজিং এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ এনক্লোজার -এ দাঁড়িয়ে সোনু জানাল পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট-এর চাকরি তার স্বামীর, ইতিমধ্যে দু’বছর কেটে গেছে। আরও তিনবছর থাকতে হবে। সেই চাইনিজ জানে না, তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে।

এয়ারপোর্টে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন বেজিঙের ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা প্রদীপকুমার রাওয়াত এবং চাইনিজ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি এবং এখন থেকে আমাদের নিত্যসঙ্গী দোভাষী বছর পঁচিশের যুবা শ্রীমান হুয়া। সে অকপটে বলে, ‘ট্রিপ্তপ্ত প্পন্দ্ব ঙ্ভ্রক্স্র প্সক্ত ঙ্ভ্রত্ত,ত্রব্দ ত্ত্সত্ত ম্নপ্তন্দ্ভ্রব্দন্দ্ব.’ বেশ চটপটে যুবক। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধির নাম ওয়াং। চিনে এসে এই এক সমস্যা টের পেলাম যা পরেও উপলব্ধি করেছি। এদের নামগুলি প্রায় একইরকমের--- দুটি নাম মনে রাখতে গিয়ে গুলিয়ে যায় অন্য নামটি। প্রদীপ রাওয়াতকে বলতে সে হেসে বলল, ‘প্রথম প্রথম এইরকম মনে হবে, পরে দেখবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ।’ আমি বললাম, ‘দেখি’। প্রদীপের হাতে আমার একটি ভিজিটিং কার্ড দিতে, কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে সে আমায় বললো, ‘তুমি তো বাংলা ভাষায় লেখো?’ আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি করে জানলে?’ সে বলল, ‘আমাদের কাছে সব তথ্য আছে।’ তার পর বলল, ‘বেজিং-এ যেসব ভারতীয় ভাষার চর্চা হয়, তার মধ্যে বাংলাও ’আছে। তোমাদের যে প্রোগ্রাম ফোল্ডার দেব, তার মধ্যেই দেখবে, বেজিং

ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়া হবে।'

আমরা এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম। একটা বড় প্যাসেনজার বাসে আমাদের হোটেল তিবেত, বেজিঙে বেশ নামডাকের হোটেল। সব মালপত্র ওই বাসেই ঠাসা হতে আমরা রওনা হলাম।

আজ রবিবার। কোনও অনুষ্ঠান নেই। হোটেলেই রাতের খাওয়া সেরে যে - যার ঘরে ঢুকে বিশ্রাম। কাল থেকে ঠাসা প্রোগ্রাম। সকালের প্রথম সূচি চিনের ভারতীয় দূতাবাসে যাওয়ার এবং রাষ্ট্রদূত নলিন সুরির সঙ্গে আলাপ করা। দুপুরে যতটা সম্ভব কয়েকটি দ্রষ্টব্য জায়গা ঘুরে দেখা। সন্ধেয় প্রদীপ রাওয়াতের বাড়িতে নৈশ আহারের নিমন্ত্রণ। বৃহস্পতিবার বিমানে সিয়ান্ যাওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যস্ত সূচি -- মিউজিয়াম অব চাইনিজ লিটারেচার, ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, তিয়েনানমেন স্কোয়ার, ফরবিডেন সিটি, বেজিং ঝিবিদ্যালয়, চিনের মহাপ্রাচীর ছাড়াও স্থানীয় রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ -- একদিনে এর একটা বা দুটো মাত্র সম্ভব। নিশ্চয়ই রাওয়াত বা চিনা প্রতিনিধি বলে দেবেন।

দুপাশে নানা রঙের ফুলগাছের মধ্য দিয়ে মসৃণ পিচের রাস্তা। চিনে এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছি, ফুলের প্রতি চিনাদের ভালবাসা। যেমন হয়, সব দেশের নিজস্ব ফুল থাকে, চিনেরও তেমনই। যে-ফুলগুলি দেখছি তার কোনটারই নাম জানিনা। কৌতূহল হওয়ায়আমাদের সামনে লম্বালম্বি সিটে বসে থাকা হুয়াকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে কোনও হদিস দিতে পারে। সে নিজেও বাইরে তাকিয়ে খানিক পর্যবেক্ষণ করে সরল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, যার অর্থ--- জানে না। ভাবলাম, না জানতেই পারে। বিশেষজ্ঞ না হলে আমরাই কি খুঁটিনাটি সব খবর রাখি!

বেলা পড়ে আসছে, আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ, রোদ নেই। পিছনে এবং পাশে আমাদের সঙ্গীদের দেখলাম, কেউ - কেউ ঢুকলেন,কেউবা ঘুমোচ্ছেন। গায়ে জ্যাকেট থাকলেও আমার শীত - শীত করছিল। সাংহাই -এ বেশ গরম ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল সাংহাই চিনের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে, বেজিং অনেকটা উত্তরে। দিল্লির চিনা দূতাবাসে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল, এখনও শীতের মরসুম শু হয়নি চিনে, তবে সাংহাই বা হ্যাংজোয় তাদের ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে ভারতের মত তাপমাত্রা হলেও বেজিং বা সিয়ান্ - এ ঠাণ্ডার দেখা মিলতে পারে। সেজন্য যে চিন্তিত হলাম তা নয়। আমরা তো তৈরি হয়েই এসেছি। জ্যাকেটের পকেট থেকে টুপিটা বের করে মাথায় দিয়ে নিলাম। পরবর্তী দিনগুলিতে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি এড়াতে প্রায়ই আমাকে টুপি ব্যবহার করতে হবে। পিছনে তাকিয়ে দেখি আরও তিনজন মাথা ঢেকে নিয়েছেন। আমাদের দেখেই দলের বয়স আন্দাজ করা যাবে। হুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, হোটেলে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে? হাতঘড়িতে চোখ রেখে সে বলল, 'অ্যানাদার ফিফটিন মিনিট্স্।'

অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশ দেখা যাছে না, আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তার পাশে। আমি আত্মগত হলাম।

চিন থেকে দেশে ফেরার পর বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'চিনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা কী হল?' আগেই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি বলে চট্পট্ উত্তর দিলাম, ওখানে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ও কদর দেখে অবাক হয়ে গেছি। ওদের কারও কারও, বিশেষত শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে, বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এই বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের কারণ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ।

বুধবার সকালে বেজিং ঝিবিদ্যালয়ে (বোর্ডে দেখেছি পিকিং ইউনিভার্সিটি লেখা) সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান স্টাডিজ এবং ইনস্টিটিউট অব ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস -এ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হল।

বেজিং ঝিবিদ্যালয়ে বিদেশি ভাষাচর্চা বিভাগে তিনটি ভারতীয় ভাষা পড়ানো হয় হিন্দি, তামিল এবং বাংলা। প্রদীপ রাওয়াতের কথায় এর একটা আভাস আগেই পেয়েছিলাম, আজকের গোলটেবিল বৈঠকে বিভাগীয় প্রধান ভিউয়ান কিউং - এর কথা থেকেই তা স্পষ্ট হল।

সেদিন আমাদের প্রত্যেককে দু-চার কথায় নিজেদের এবং নিজেদের লেখালিখির পরিচয় দিতে হল। অবশ্যই ইংরেজিতে। আমাদের দোভাষী বন্ধু হুয়া চটপট সেগুলির চিনা অনুবাদও শুনিয়ে দিলেন। আমাদের হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর বক্তব্যে প্রেমচন্দ্রকে আকাশছোঁওয়া করে থামলেন। রবীন্দ্রনাথ যে এখানে খুবই পরিচিত ও প্রিয় নাম, তা আমি আগেই জেনেছি। তাঁর আবক্ষ মূর্তিও দেখেছি। সুতরাং আমার বক্তব্যের মধ্যে ইতস্তত না করেই বললাম, 'আমি ভারতীয় বাঙালি, এবং আমার লেখার ভাষা বাংলা। এ সেই ভাষা যে - ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখতেন।' সচেতন হয়ে লক্ষ করলাম রবীন্দ্রন

াথেরর নামে অনুচচ গুঞ্জন শু হল চিনাদের মধ্যে, মুখগুলিও উদ্ভাসিত। শিক্ষকদের পিছনে দাঁড়ানো দুজন ছাত্রী এবং অ ার এক ভদ্রলোক, সম্ভবত ছাত্র, বিভাগীয় প্রধানকে বললেন কিছু, তিনিও মাথা নাড়লেন।

সকলের পরিচয় দেওয়া শেষ হবার পর বিভাগীয় প্রধান বললেন, 'আপনাদের সব ভাষার প্রতিনিধির বক্তব্য আমরা মন দিয়ে শুনেছি এবং সবই ভাল লেগেছে, তবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ, শ্রীযুক্ত পালিত যা বললেন তা যদি রবীন্দ্রন াথের ভাষা বাংলায় আমাদের শোনান তাহলে আমরা খুশি হব।'

আমি হঠাৎ-ই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত, এদিক - ওদিক তাকাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্তি বললেন, 'স্পিক মিস্ট ার পালিত, দিস ইজ টু অনার টেগোর।' মুহূর্তে জড়তা কাটিয়ে আমি বাংলায় বলতে শু করলাম। আমার বলা শেষ হলে এরা নিজেদের ভাষায় অভিনন্দন জানাল। আমার কণ্ঠস্বর ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে তখনও।

চশমার কাচ মোছার অছিলায় আমি মালের চোখ দুটোও মুছে নিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের -- বাঙালির ও বাংলা ভ াষার-- কতখানি, দেশে থাকতে আমরা সবসময় তা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু চিনে এসে সেই মুহূর্তে যে - অভিজ্ঞত া হল, আবেগে তাবাঙালি মাত্রেরই চোখে জল এনে দিতে পারে। শুধু বেজিংয়েই নয়, সিয়ান, হ্যাংজো, সাংহাই সর্বত্রই স্থ ানীয় রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় এসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। যথাসাধ্য উত্তরও দিয়েছি। সত্যি বলতে ভারতের এতগুলি ভাষার আর কোন লেখক বা কবি সম্পর্কে ওদের কিছু জানা নেই, জানবার কে ান আগ্রহও নেই। তবে ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার- এর বশাল লাইব্রেরিতে, শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কয়েকজন ভারতীয় লেখকের বই আছে। সে - সব লেখক কারা বা লাইব্রেরিটি কেমন -- আমাদের ভ্রমণসূচীর মধ্যে না থ াকায় তা দেখার সুযোগ হয়নি।

বেজিং ঝিবিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা বিভাগে থাকতে বাংলায় মুদ্রিত ওদের পাঠ্য বই - এর কিছু নমুনা আমার দেখার সুযে াগ হয়েছিল। যাঁরা সদ্য বাংলা শিখতে শু করেছেন তাঁদের জন্য এই বইগুলি সেখানকার শিক্ষকরাই রচনা করেছেন। উল্টে - পাল্টে দেখলাম কোন ছাপার বুল বা বানান ভুল নেই। বাগ্যগঠনেও নেই কোন অসংগতি। পড়তে - পড়তে মনে হয় বিদ্যাসাগরের বণাপরিচয় বা কথামালা পড়ছি, এতই সহজ ও সাবলীল।

লেকচার ম থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে বাংলা ভাষার তিন ছাত্রী -- সিযাং, চামচুম ও ইয়াং এবং হিন্দির এক শিক্ষক। তিন যুবতীর মুখে অনর্গল বাংলা শুনে আমিও কল্লোলিত বোধ করছি, এ এক আশর্চ্য অনুভূতি। এদের মধ্যে সিয়াং -এর ভাষা একেবারেই বাংলা কথ্যভাষা, উচচারণের টান - টোনগুলিও নির্ভুল। সে নিজেই বলল, তার একটি বাংলা ডাকনাম আছে -- রাখী।

সামনে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি। ওই পর্যন্ত গিয়ে সিয়াং বলল, 'এই মূর্তির পাশে দাঁড়ান। আপনার একটা ছবি তুলে দিই। সেই ছবি দেখলে আপনার আমাদের মনে পড়বে।'

মনে অবশ্যই পড়বে। ভাবলাম, ভারত থেকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কলকাতা থেকে এত দূরে তিন চিনা যুবতীর গলায় শুনতে পাব নির্ভুল ও সাবলীল বাংলা ভাষা, কখনও কি ভেবেছিলাম! মনে হল, এখনও অনেক দেখা বাকি থাকলেও, এই অভিজ্ঞতাই আমার চিনে আসা সার্থক করল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com